

কৃষিই সমৃদ্ধি

প্রশিক্ষণ সিডিউল ও প্রশিক্ষণ বার্তা

আগস্ট/২০২৩



উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রশিক্ষণ সিডিউল- ০১

তারিখঃ ০১ আগস্ট, ২০২৩

সাপ্তাহিক কনফারেন্স ও প্রশিক্ষণ সেশনের রূপরেখা

| সময় | বিষয় | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |
|------------------------------|--|---------------------------|
| ১০.০০-১১.০০ | গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন সংগ্রহ/ছকপত্র/নির্দেশনা প্রদান, বিগত/বর্তমানে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংশোধন এবং অতন্দ্রজরিপ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা। | এইও/ এএইও/ এসএপিপিও |
| ১১.০০-১১.৩০ | বিভিন্ন প্রকল্প/বিশেষ কর্মসূচী/গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশনা প্রদান, বিগত সপ্তাহের ট্র্যার নোট উপস্থাপন এবং প্রশিক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা। | ইউএও/ এইও |
| ১১.৩০-১২.৩০ প্রথম ক্লাস | বাংলাদেশের ফসল পঞ্জিকা | ইউএও |
| ১২.৩০-১.০০ দ্বিতীয় ক্লাস | শস্য বহুমুখীকরণ ও শস্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্য | এইও |
| ১.০০-২.০০ | নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি | |
| ২.০০-২.৩০ তৃতীয় ক্লাস | পোকা দমনে আলোক ফাদের গুরুত্ব | এসএপিপিও |
| ২.৩০- ৩.০০ চতুর্থ ক্লাস | মাল্টার ক্যাংকার রোগ ব্যবস্থাপনা | এসএপিপিও |
| ৩.০০-৪.০০ পঞ্চম ক্লাস | মাল্টার আগামরা রোগ ব্যবস্থাপনা | এইও |

জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উপজেলা কৃষি অফিসার
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রশিক্ষণ সিডিউল- ০২

তারিখঃ ১৬ আগস্ট, ২০২৩



সাপ্তাহিক কনফারেন্স ও প্রশিক্ষণ সেশনের রূপরেখা

| সময় | বিষয় | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |
|------------------------------|---|---------------------------|
| ১০.০০-১১.০০ | গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন সংগ্রহ/ছকপত্র/নির্দেশনা প্রদান, বিগত/বর্তমানে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংশোধন এবং অতন্দ্রজরিপ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা। | এইও/ এএইও/ এসএপিপিও |
| ১১.০০-১১.৩০ | বিভিন্ন প্রকল্প/বিশেষ কর্মসূচী/গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশনা প্রদান, বিগত সপ্তাহের ট্রায় নোট উপস্থাপন এবং প্রশিক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা। | ইউএও/ এইও |
| ১১.৩০-১২.৩০ প্রথম ক্লাস | জৈব সার ও এর উপকারিতা | ইউএও |
| ১২.৩০-১.০০ দ্বিতীয় ক্লাস | ধানের হলুদ মাজরা পোকাকার ক্ষতির ধরণ সনাক্ত ও দমন ব্যবস্থাপনা | এইও |
| ১.০০-২.০০ | নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি | |
| ২.০০-২.৩০ তৃতীয় ক্লাস | মাল্টার স্কেল ইনসেক্ট বা খোসা পোকা দমন ব্যবস্থাপনা | এসএপিপিও |
| ২.৩০-৩.০০ চতুর্থ ক্লাস | মরিচ গাছের পাতা কোকড়ানো রোগ দমন ব্যবস্থাপনা | এসএপিপিও |
| ৩.০০-৪.০০ পঞ্চম ক্লাস | ফলগাছে সার প্রয়োগের নীতি | এইও |

জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উপজেলা কৃষি অফিসার
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বাংলাদেশের ফসল পঞ্জিকা

 চারা উৎপাদন
 ফসল উৎপাদন


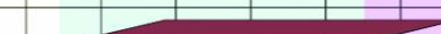
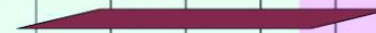
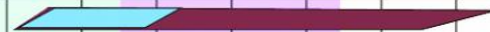
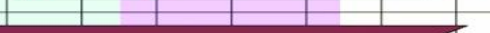
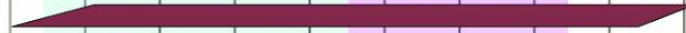

















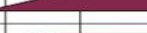

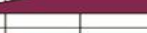
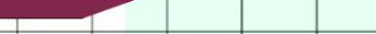







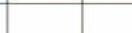
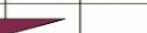


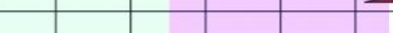


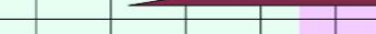

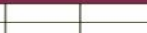

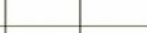
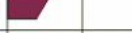
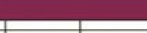



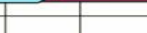


বাংলাদেশের ফসল পঞ্জিকা

কৃষির মৌসুম ৩টি

০ রবি মৌসুম, ১৬ অক্টোবর-১৫ মার্চ বা কার্তিক-জ্যৈষ্ঠ

০ খরিফ-১ মৌসুম, ১৬ মার্চ-১৫ জুলাই বা চৈত্র-আষাঢ়

০ খরিফ-২ মৌসুম, ১৬ জুলাই-১৫ অক্টোবর বা শ্রাবণ-আশ্বিন

| শস্য | জানু. | ফেব্রু. | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টে. | অক্টো. | নভেম্ব. | ডিসে. |
|------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---------|--------|---------|---|
| রোপা আউশ | | |  |  | | | | | | | | |
| বোনা আউশ | | | |  | | | | | | | | |
| রোপা আমন | | | | |  |  | | | | | | |
| বোনা আমন | | |  | | | | | | | | | |
| বোরো |  |  | | | | | | | | | |  |
| গম |  | | | | | | | | | | |  |
| ভুট্টা (রবি) |  | | | | | | | | | | |  |
| ভুট্টা (খরিফ) | | | |  | | | | | | | | |
| আলু |  | | | | | | |  | | | | |
| মিষ্টি আলু |  | | | | | | | | | | |  |
| মসুর |  | | | | | | | | | | |  |
| ছোলা |  | | | | | | | | | | |  |
| খেসারি |  | | | | | | | | | | |  |
| মুগ (রবি) |  | | | | | | | | | | |  |
| মুগ (খরিফ) | | |  | | | | | | | | | |
| মাসকলাই |  | | | | | | | | | | |  |
| মটর |  | | | | | | | | | | |  |
| সয়াবিন (রবি) |  | | | | | | | | | | |  |
| সয়াবিন (খরিফ) | | | | | | |  | | | | | |
| সরিষা |  | | | | | | | | | | |  |
| চিনাবাদাম (রবি) |  | | | | | | | | | | |  |
| চিনাবাদাম (খরিফ) | | | | |  | | | | | | | |
| তিল (রবি) |  | | | | | | | | | | |  |
| তিল (খরিফ) | | | |  | | | | | | | | |
| আদা |  | | | | | | | | | | |  |
| হলুদ |  | | | | | | | | | | |  |
| পেঁয়াজ (রবি) |  | | | | | | | | | | |  |
| পেঁয়াজ (খরিফ) | | |  |  | | | | | | | | |
| রসুন |  | | | | | | | | | | |  |
| ধনিয়া |  | | | | | | | | | | |  |

রবি

খরিফ-১

খরিফ-২

রবি

শস্য বহুমুখীকরণ ও শস্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্য

মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণ বলতে কোনো একক ফসল বা একক প্রযুক্তির উপর নির্ভর না করে ফসল বিন্যাস, মিশ্র ও সাথি ফসলের চাষ ও খামার যান্ত্রিকীকরণকে বোঝায়।

শস্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- ১। কাজিষ্কৃত ফসল বিন্যাস, শস্যের আবাদ বাড়ানো এবং কৃষকের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
- ২। খামারের কর্মকাণ্ড সমন্বয় করা এবং কৃষি পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব কমিয়ে আনা।
- ৩। প্রচলিত শস্যবিন্যাসে উন্নত ফসলের জাত ও কলাকৌশলের সংযোগ ঘটানো।
- ৪। বীজের সাশ্রয় করা এবং উৎপাদন খরচ কমানো।
- ৫। প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও সমাধান করা।

১। ফসলবিন্যাস : বাংলাদেশের ভূমি নানা জাতের ফসল চাষের উপযোগী। তবে প্রতিটি কৃষকই ফসলের বিন্যাস করে আবাদ করেন। ফসলবিন্যাস অর্থ হচ্ছে কৃষক সারা বছর বা ১২ মাস তার জমিতে কী কী ফসল ফলাবেন তার একটা পরিকল্পনা করা। ফসলবিন্যাস করা হয় মাটির গুণাগুণ, পানির প্রাপ্যতা, চাষ পদ্ধতি, শস্যের জাত, ঝুঁকি, আয় এসব বিষয় বিবেচনা করে। ফসলবিন্যাসে একটি শিম জাতীয় ফসল অন্তর্ভুক্ত করে সারের চাহিদা হাস করা সম্ভব এবং তাতে মাটির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাবে।

২। মিশ্র ও সাথি ফসলের চাষ : মিশ্র ও সাথি ফসলের চাষ বলতে একাধিক ফসল যা ভিন্ন সময়ে পাকে, ফ্রমবৃদ্ধির ধরন ভিন্ন, মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে খাদ্য আহরণ করে এরূপ ফসলের একত্রে চাষকে বোঝায়। মিশ্র ও সাথি ফসলে পোকামাকড়, রোগবলাই এবং আবহাওয়াজনিত ঝুঁকি হাস পায।

৩। শূন্য চাষ পদ্ধতি : শূন্য চাষ অর্থ হচ্ছে বিনা চাষে ফসল ফলানো। বন্যাকবলিত এলাকায় ধানভিত্তিক ফসল বিন্যাসে শূন্য চাষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন, বন্যার পানি নেমে গেলে মাটিতে রস থাকা অবস্থায় মসুর, ভুট্টা, রসুন ইত্যাদি রোপণ বা লাগানো যায় এবং ভালো ফলনও পাওয়া যায়। এতে কৃষকের ৩-৪ সপ্তাহ সময় বাঁচে।

৪। রিলে চাষ : কৃষকেরা একটি শস্যে ফুল আসার পর, কিন্তু কর্তনের প্রায় এক সপ্তাহ আগে কতিপয় সুবিধা পাওয়ার জন্য শিম জাতীয় বীজ বপন করেন। একেই রিলে চাষ বলা হয়। রিলে চাষের উদ্দেশ্য হলো সেচের সীমাবদ্ধতা, শ্রম ঘাটতি এবং সময়ের অভাব দূর করা। আমাদের কৃষকেরা সাধারণত ধানের ক্ষেতে রিলে চাষ করে থাকেন। রিলে চাষ দ্বারা মাটির গঠন উন্নত হয় এবং উর্বরতা বৃদ্ধি পায।

৫। সম্পদের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার : মাঠ ফসল বহুমুখীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- (১) অধিক উৎপাদন এবং (২) অধিক আয়। জমি, সময়, বীজ, সার, সেচের পানি, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি প্রযুক্তি এগুলো হচ্ছে কৃষকের কৃষি সম্পদ। কৃষকের আয় নির্ভর করে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর। যেমন- মিশ্র বা সাথি ফসলের চাষ হতে কৃষক অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন। আবার বিনা চাষে ফসল ফলালে সময় ও অর্থ উভয়ের সাশ্রয় হয়। আবার ফসল বিন্যাসে শিম জাতীয় শস্য আবাদের ব্যবস্থা থাকলে সারের চাহিদা হাস পাবে।

পোকা দমনে আলোক ফাঁদের গুরুত্ব

ফসলের শত্রু অনেক। এর মধ্যে পোকামাকড় ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করে। এ দেশে ফসলের ক্ষতিকর পোকা দমনে প্রধানত বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা হয়, যা পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বা আইপিএম একটি আধুনিক ধারণা। এ পদ্ধতিতে কীটনাশক ছাড়া অন্যান্য অনেক পদ্ধতিতে ক্ষতিকর পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বিশেষ করে আলোকফাঁদ ও ক্ষেতে ডাল পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করে অনেক পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আলোকফাঁদ প্রকৃত অর্থে ফসলে পোকার উপস্থিতি যাচাই বা মনিটরিংয়ের একটি যন্ত্রবিশেষ। কিন্তু এটা দিয়ে শুধু পোকার উপস্থিতি যাচাই না করে ক্ষেতের পাশে নিয়মিতভাবে পেতে রেখে অনেক পোকা আলোতে আকৃষ্ট করে মারা যায়। এটি পোকা নিয়ন্ত্রণে একটি যান্ত্রিক পদ্ধতিবিশেষ। আলোকফাঁদ এ দেশে বহুকাল আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচীনকালে ক্ষেতের ধারে রাতে মশাল জ্বলে বানর ও বুনো শূকরের মতো ফসল-অনিষ্টকারী জীবজন্তুকে ভয় দেখানো হতো। এতে ফসল-অনিষ্টকারী পোকাও মারা পড়ত। কিন্তু এককালে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে আধুনিক নিয়মে আলোকফাঁদ তৈরি ও ব্যবহার করা হতো না। এ দেশেও অতীতে হারিকেন জ্বলে

আলোক ফাঁদ দেয়া হতো। এরূপ ফাঁদে আলোর তীব্রতা কম থাকায় পোকা খুব কম আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ হারিকেন দিয়ে বানানো আলোক ফাঁদের ক্যাচমেন্ট এরিয়া বা পোকাদের আকৃষ্ট করে পুড়িয়ে মারার ক্ষমতা খুবই কম।

আলোক ফাঁদ : ফাঁদ হলো কোনো কিছু আটকানোর একটা যন্ত্র। এই যন্ত্রে নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করে শিকার ধরা বা আটকানোর ব্যবস্থা করা হয়। বেশ কিছু পোকা আছে যারা আলোতে আকৃষ্ট হয়। তাই আলোক ব্যবহার করে আলো-আকর্ষী এসব পোকা আটকানোর বা আকৃষ্ট করে মেরে ফেলার জন্য যে ফাঁদ তৈরি করা হয় তাকেই আলোক ফাঁদ বলে।

আলোক ফাঁদের উপকারিতা : আলোকফাঁদ মূলত একটি মনিটরিং যন্ত্র, যা দিয়ে ক্ষেতে কী কী পোকা আছে তা দেখা যায়। আলোকফাঁদ দ্বারা অনেক ধরনের পোকামাকড়ের উপস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে জরিপ করা যায়। বিশেষত ফসলের যেসব পোকা আলোতে আকৃষ্ট হয় তা ক্ষেতের কাছে আলোকফাঁদ পাতলে তাতে আকৃষ্ট হয় এবং মারা পড়ে। অনেক নিশাচর প্রকৃতির পোকাও আলোকফাঁদে ধরা পড়ে। তবে আলোর গুণাগুণের ওপর ফাঁদের কার্যকারিতা নির্ভর করে। ফ্লোরোসেন্ট বা তীব্র আলোর ফাঁদে বেশি পোকা আসে। এ ছাড়া হ্যাজাক বাতি এবং ২০০ ওয়াটের বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে ভালোভাবে পোকা দমন করা যায়। তবে কেরোসিন বাতি বা হারিকেনের আলোয় পোকা আসে সবচেয়ে কম। এমনকি টায়ার পুড়িয়ে বা মশাল জ্বলেও অনেক পোকা দমন করা যায়, যেমন ধানের গান্ধী পোকা। এসব ফাঁদ তৈরি ও ব্যবহার অত্যন্ত সহজ হওয়ায় দিনে দিনে তা কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তা ছাড়া পোকা নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতি সস্তা ও পরিবেশবান্ধব। বর্তমানে কৃষি বিভাগের পরামর্শে আমন ধানের ক্ষেতে ব্যাপকভাবে সারা দেশে আলোকফাঁদ ব্যবহার করা হচ্ছে।

যেসব পোকা আলোকফাঁদ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় : ফসলের শত্রু ও মিত্র সব ধরনের পোকাই আলোতে আকৃষ্ট হয়। বকু পোকাদের মধ্যে বোলতা, লেগি বার্ড বিটল, ক্যারাবিড বিটল, ড্যামসেল ফ্লাই ইত্যাদি। তথাপি ফসলের বেশ কিছু প্রধান ক্ষতিকর পোকাকে আলোকফাঁদ দিয়ে সফলতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বিশেষত ধানের মাজরা পোকা, সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং, সাদা পিঠ গাছফড়িং, কমলা মাথা পাতাফড়িং, সাদা পাতাফড়িং, নলি মাছি, পাতা মোড়ানো পোকা, চুঞ্জি পোকা, খ্রিপস, খাটো শূঁড় ঘাসফড়িং ইত্যাদি। সবজি ফসলেরও অনেক পোকা যেমন কাটুই পোকা, সরুই পোকা বা ডায়মন্ড ব্যাক মথ, পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা ইত্যাদি আলোকফাঁদে ধরা পড়ে।

ফাঁদ তৈরির পদ্ধতি : আলোকফাঁদ তৈরির কৌশল খুব সহজ। এই ফাঁদ তৈরি করতে গেলে লাগে বৈদ্যুতিক বাতি বা হ্যাজাক বাতি। এখন চার্জার লাইট দিয়ে এক রকম বিনা খরচে সবচেয়ে কার্যকর আলোকফাঁদ তৈরি করা হচ্ছে। যেখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই সেখানে হ্যাজাক বাতি ও চার্জার লাইট দিয়ে আলোকফাঁদ তৈরি করা ভালো। আলোকফাঁদের জন্য লাগবে পাঁচ ফুট লম্বা সরু তিনটি বাঁশের টুকরা, গুনা তার, একটি প্লাস্টিক বা মাটির বড় জালা/চারি/গামলা এবং পানি। তিনটি বাঁশের মাথা গুনা তার দিয়ে বেঁধে গোড়া ফাঁক করে তিন দিকে দিয়ে সেটিকে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। নিচে রাখতে হবে পানিভর্তি গামলা। গামলার পানিতে একটু তরল বা গুঁড়া সাবান গুলে দিতে হবে। এতে পানিতে পড়া পোকারা আর উঠতে পারবে না। বাঁশের মাথায় ঝুলিয়ে দিতে হবে বৈদ্যুতিক বাতি, চার্জার বা হ্যাজাক। সেটি জ্বালালেই তার আলোতে পোকারা আকৃষ্ট হয়ে আসতে শুরু করবে। তবে কেউ কেউ গামলা মাটিতে না রেখে কিছুটা উঁচুতে আলোর কাছাকাছি রাখেন। এতে পোকা মারা পড়ে বেশি। সে জন্য বাঁশের তিনপেয়ে খুঁটির সাথে আড়াআড়ি করে তিনটি বাঁশের চটা বা কাঠের বাতা পেরেক দিয়ে মেরে দিতে হবে। এর ওপর থাকবে মাটির চারি বা গামলা। দক্ষিণাঞ্চলে ঘের বা জলি আমন ধানের জমি, যার আশপাশে উঁচু কোনো জায়গা পাওয়া যায় না সেসব জমির মাঝে কোনো ফসলবিহীন ফাঁকা জলাশয় বা নালা থাকলে তার ওপর বাঁশের খুঁটি দিয়ে আলোকফাঁদ টাঙানো যায়। এতে পোকা আলোতে আকৃষ্ট হয়ে পানির মধ্যে পড়ে এবং পানিতে থাকা মাছ সেসব পোকা খায়। তবে পানি তলের উচ্চতা ও আলোর দূরত্ব কাছাকাছি থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে যেসব পোকা আলোতে আকৃষ্ট হয়ে আসবে তা আর উড়ে পালাতে পারবে না। এটি একটি খুবই সাধারণ ফাঁদ। অনেকে বৈদ্যুতিক বাত্বের নিচে একটি টিনের বড় ফানেল পেতে তার নিচে বড় একটা প্লাস্টিকের কৌটা বা বয়াম লাগিয়ে দেন। এতে আলোতে পোকা আকৃষ্ট হয়ে ফানেলের মধ্যে পড়বে এবং ফানেলের নল বেয়ে নিচে কৌটায় গিয়ে জমা হবে, আর বের হতে পারবে না। সকালে কৌটা খুলে পোকা বের করে ধ্বংস করে ফেলুন।

ফাঁদ পাতার নিয়ম : আলোকফাঁদ কখনো ক্ষেতের মধ্যে পাতা যাবে না। পাততে হবে ক্ষেত থেকে অন্তত ৫০ থেকে ১০০ মিটার দূরে, ফাঁকা জায়গায়, যেখানে কোনো ফসল নেই। তা না হলে পোকারা আকৃষ্ট হয়ে আসবে, সব তো মরে না বা পানিতে পড়ে না। কিছু পোকা আলোকফাঁদের চার দিকে নিচে জমিতে পড়ে সেখানেই বসে থাকে। যদি ফসল থাকে, তবে ওরা তার খুব ক্ষতি করে। আলোকফাঁদ পাততে হবে সন্ধ্যাবেলায়। ফসলের যেকোনো স্তরে পাতা যায়, তবে লক্ষ রাখতে হবে যখন বিভিন্ন শত্রু পোকার কিছু পূর্ণাঙ্গ পোকা ক্ষেতে আসতে শুরু করে তখনই আলোকফাঁদ পাতার উপযুক্ত সময়। ধানগাছের বাড়ন্ত স্তর, বিশেষ করে কুশি স্তরে ঘন ঘন অর্থাৎ প্রতিদিনই আলোকফাঁদ দিলে সবচেয়ে বেশি পোকা ধরা পড়ে ও উপকার বেশি পাওয়া যায়। পোকা গাছে ডিম পাড়া শুরু করার আগেই ওদের দফা রফা করতে পারলে ভালো হয়। বিশেষ করে মথ জাতীয় যেসব পোকা আছে, তা

- সাবধানতাঃ

বাগান অপরিচ্ছন্ন রাখবেন না।

- করনীয়ঃ

১।ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাটাই করে পরিষ্কার করে দিন ২।পরিষ্কার করার পর একটি হত্রাক নাশক ও একটি কীটনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন ৩। নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

জৈব সার ও এর উপকারিতা

জৈব সার

যেসব প্রাণিজ বা উদ্ভিজ পদার্থ পুষ্টি উপাদান ধারণ করে এবং ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য জমিতে ব্যবহার করা হয় তাকে জৈব সার বলা হয়। প্রাণিজ সার বলতে গৃহপালিত পশুপাখির মলমূত্র পচিয়ে তৈরিকৃত বস্তুকে বোঝায়। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রাণিজ জৈব সার হচ্ছে গোবর। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাপ্ত গোবরের এক বিরাট অংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গরুর নিচে বিছানো খড়, গৃহস্থালির উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি, বাড়ির ঝাট দেয়া আবর্জনা প্রভৃতি গোবর মিশ্রিত করে পচানো সারকে খামারজাত সার বলে।

ফসলের পরিত্যক্ত অংশ (খড়) যতটুকু সম্ভব জমিতে রেখে দিয়ে অথবা জমিতেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে পরে চাষের সময় মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দেয়া ভালো। যদিও দেশজুড়ে জ্বালানি হিসেবে এগুলোর মূল্য রয়েছে, তথাপি মাটির উন্নয়নকল্পে যতটুকু সম্ভব তা জমিতে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা উচিত। তাহলে ফসলের পরিত্যক্ত অংশে যে পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে সেগুলো হারিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আবার মাটিতে ফিরে আসবে।

জৈব সারের উপকারিতা:

জৈব পদার্থ হ'ল মাটির প্রাণবন্ত। জৈব সার ব্যবহারের ফলে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ে। জৈব সার ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা বাড়ে। এতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম এবং অন্যান্য পুষ্টি রয়েছে যা ফসলের প্রধান খাদ্য এবং এইভাবে ক্ষুদ্রাকৃতির উপাদানগুলির ঘাটতিও পূরণ হয়। মাটির কাঠামো এবং গুণমান উন্নত করে। বালুকাময় মাটি সরস হয়ে যায়, জলের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তাছাড়া কাদামাটি কিছুটা দোলা তৈরি করে মাটিটিকে আরও উর্বর করে তোলে। মাটিতে জৈব সার প্রয়োগ করার পরে, গাছটি ধীরে ধীরে এটি প্রয়োজনীয়তা হিসাবে অনেক দিন ধরে শুষে নিতে পারে। জমিতে দেয়ার পরে এটি প্রায় ৬-১৮ মাসের পরে প্রভাব ফেলতে পারে। এটি পরবর্তী ফসলেও উপকারী। জৈব সার ব্যবহারের ফলে মাটিতে উপকারী জীবাণুগুলির ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের প্রজননে সহায়তা করে। এই পদ্ধতিতে মাটি থেকে সহজ উপায়ে খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে গাছটি দ্রুত বাড়তে পারে। জৈব সার গাছের শিকড় এবং অঙ্গ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কেঁচো, পিঁপড়া, মাটিতে গর্ত তৈরি করে যেখানে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। এটি শিকড়গুলিকে আরও অক্সিজেন দেয় এবং মাটিতে বায়ু সঞ্চালনে সহায়তা করে। ফলস্বরূপ, গাছটি সতেজ হয়ে উঠেছে। গ্রীষ্মে মাটির তাপমাত্রা হ্রাস করে এবং শীতে উষ্ণ রাখতে সহায়তা করে। এটি সমস্ত মৌসুমে গাছের শিকড় বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। মাটিতে স্যাপ সংরক্ষণ করতে সহায়তা করে এবং জল সহজেই ধরে রাখে। ফলস্বরূপ, সেচ জলের বেশি ব্যবহার হয়। জৈব সার ব্যবহারে রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়তা করে এবং জৈব সার ব্যবহার একটি আনুপাতিক হারে রাসায়নিক সারের মাত্রা হ্রাস করতে পারে। জৈব সার মাটিতে কীটনাশক এবং রাসায়নিক সারের আধিক্যজনিত কারণে যে কোনও বিষের বিষ হ্রাস করতে সহায়তা করে। এমনকি যদি আরও জৈব সার ব্যবহার করা হয় তবে মাটির কোনও ক্ষতি হয় না। জৈব সার ফসলের ফলন বৃদ্ধি করে এবং গুণগতমান বৃদ্ধি করে এবং সঞ্চিত শস্যের সঞ্চয়ের ক্ষমতা বাড়ায়।

ধানের হলুদ মাজরা পোকাকার ক্ষতির ধরণ সনাক্ত ও দমন ব্যবস্থাপনা

পরিচিতিঃ

- বাংলাদেশে ধানের তিন ধরনের মাজরা পোকাকার আক্রমণ দেখা যায়। যেমনঃ ১। হলুদ মাজরা পোকা ২। কালো মাথা মাজরা পোকা ৩। গোলাপী মাজরা পোকা।
- এই পোকাকুলোর কীড়ার রঙ অনুযায়ী তাদের নামকরণ করা হয়েছে। এদের আকৃতি ও জীবন বৃত্তান্তে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও ক্ষতির ধরন এবং দমন পদ্ধতি একই রকম। হলুদ মাজরা পোকা প্রধানত বেশি আক্রমণ করে বলে নিচে এই পোকাকার বিবরণ দেয়া হলঃ
- পূর্ণবয়স্ক হলুদ মাজরা পোকা এক ধরনের মথ। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকাকার পাখার উপরে দু'টো কালো ফোটা আছে। পুরুষ মথের মাঝখানে ফোটা স্পষ্ট নয়। তবে পাখার পিছন দিকে ৭-৮ টা অস্পষ্ট ফোটা আছে।
- গাছে মাজরা পোকাকার ডিমের গাদা দেখলে বুঝতে হবে গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
- হলুদ মাজরা পোকাকার ডিমের গাদার ওপর হালকা ধূসর রঙের একটা আবরণ থাকে।
- সব মাজরা পোকাকার মথই নিশাচর। দিনে এগুলো পাতার নিচে লুকিয়ে থাকে। কেবল রাতে অন্ধকারে এরা চলাফেরা করে। এরা সবাই আলোর দিকে আকৃষ্ট হয়।



ক্ষতির ধরণঃ

- মাজরা পোকাকার কীড়াগুলো কান্ডের ভেতরে থেকে খাওয়া শুরু করে এবং ধীরে ধীরে গাছের ডিগ পাতার গোড়া খেয়ে কেটে ফেলে। ফলে ডিগ পাতা মারা যায়। একে 'মরা ডিগ' বা 'ডেডহার্ট' বলে।
- মাজরা পোকাকার আক্রমণ হলে, কান্ডের মধ্যে কীড়া, তার খাওয়ার নিদর্শন ও মল পাওয়া যায়, অথবা কান্ডের বাইরের রং বিবর্ণ হয়ে যায় এবং কীড়া বের হয়ে যাওয়ার ছিদ্র থাকে।
- মাজরা পোকাকার কীড়াগুলো ডিম থেকে ফুটে রেরুবার পর আস্তে আস্তে কান্ডের ভেতরে প্রবেশ করে।
- কীড়ার প্রথমাবস্থায় এক একটি ধানের গুছির মধ্যে অনেকগুলো করে গোলাপী ও কালোমাথা মাজরার কীড়া জড়ো হতে দেখা যায়।
- কিন্তু হলুদ মাজরা পোকাকার কীড়া ও পুত্তলীগুলো কান্ডের মধ্যে যে কোন জায়গায় পাওয়া যেতে পারে।
- আলোর চার পাশে যদি প্রচুর মাজরা পোকাকার মথ দেখতে পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে ক্ষেতের মধ্যে মথগুলো ডিম পাড়া শুরু করেছে।
- ক্রিসেক রোগের অথবা হুঁদুরের ক্ষতির নমুনার সাথে মাঝে মাঝে মাজরা পোকা দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত মরা ডিগ বলে ডুল হতে পারে। মরা ডিগ টান দিলেই সহজে উঠে আসে। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত গাছের কান্ডে মাজরা পোকা খাওয়ার দরুণ ছিদ্র এবং খাওয়ার জায়গায় পোকাকার মল দেখতে পাওয়া যায়।



ক্ষতির ব্যাপ্তিঃ

- গবেষণায় দেখা গেছে- ধান ক্ষেতের শতকরা প্রায় ৭০ – ৮০ ভাগ ফসলই নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যদি সময়মত মাজরা পোকা দমন না করা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- নিয়মিতভাবে ক্ষেত পর্যবেক্ষণের সময় মাজরা পোকাকার মথ ও ডিম সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেললে মাজরা পোকাকার সংখ্যা ও ক্ষতি অনেক কমে যায়। খোর আসার পূর্ব পর্যন্ত হাতজাল দিয়ে মথ ধরে ধুংস করা যায়।
- ক্ষেতের মধ্যে ডালপালা পুঁতে পোকা খেকো পাখির বসার সুযোগ করে দিলে এরা পূর্ণবয়স্ক মথ খেয়ে এদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।
- মাজরা পোকাকার পূর্ণ বয়স্ক মথের প্রাদুর্ভাব যখন বেড়ে যায় তখন ধান ক্ষেত থেকে ২০০-৩০০ মিটার দূরে আলোক ফাঁদ বসিয়ে মাজরা পোকাকার মথ সংগ্রহ করে মেরে ফেলা যায়।
- যে সব অঞ্চলে হলুদ মাজরা পোকাকার আক্রমণ বেশী, সে সব এলাকায় সম্ভব হলে চান্দিনার (বি আর ১) মত হলুদ মাজরা পোকা প্রতিরোধ সম্পন্ন জাতের ধান চাষ করে আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

- ধানের জমিতে শতকরা ১০-১৫ ভাগ মরা ডিগ অথবা শতকরা ৫ ভাগ মরা শীষ পাওয়া গেলে অনুমোদিত কীটনাশক (যেমন- ডায়াজিনন ৬০ ইসি, কার্বোফুরান ৫জি, ফেনিট্রথিয়ন ৫০ ইসি ইত্যাদি) ব্যবহার করা।

ফলগাছে সার প্রয়োগের নীতি

ফল গাছ মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি উপাদান আহরণ করে থাকে। গাছের বৃদ্ধি বিকাশ, ফুল-ফল ধারণ ও মানসম্মত ফল উৎপাদনে এবং বলশালী চারা/কলম প্রাপ্তির জন্য প্রতি বছর অন্তত দুবার মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ আবশ্যিক। নিম্নে ফল গাছে সার প্রয়োগের কতিপয় সাধারণ নীতিমালা উল্লেখ করা হলো-

- ফল গাছে সাধারণত বর্ষা মৌসুম শুরু হবার আগে মে-জুন মাসে ১ বার এবং বর্ষাকাল শেষ হবার পরে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আর একবার সার প্রয়োগ বিধেয়। গাছের ক্যানোপি এরিয়া যতদূর বিস্তৃত হয় অর্থাৎ গাছের ছায়া যে দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছায় ওই দূরত্বে সারপ্রয়োগ করতে হবে কারণ গাছের জন্য খাদ্য শোষণকারী মূলসমূহ প্রধানত ওই দূরত্বে বিচরণ করে। ছোট গাছের বেলায় ওই দূরত্ব গাছের গোড়া থেকে চারিদিকে ০.৫-১ মিটার এবং বড়গাছের বেলায় ১-১.৫ মিটার হয়ে থাকে। ওই দূরত্বে গাছের গোড়ার চারিদিকের মাটি আলতোভাবে কুপিয়ে কিংবা চারিদিকে ৫০ সেমি. গভীর গর্ত (Trench) তৈরি করে সার প্রয়োগ করতে হবে।
- সার প্রয়োগের পর গাছের চতুর্দিকে একটি আইল (band) তৈরি করে দিতে হবে যাতে সেচ ও বৃষ্টির পানি সার দ্রব্য খুইয়ে অপচয় করতে না পারে। সাধারণত একবীজপত্রী উদ্ভিদের (নারিকেল, সুপারি, তাল ইত্যাদি) ক্ষেত্রে গর্ত পদ্ধতিতে এবং দ্বিবীজপত্রী (আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ইত্যাদি) উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মাটি কুপিয়ে সার দ্রব্য ছিটিয়ে প্রয়োগ করা উত্তম।
- সার দ্রব্য প্রয়োগের পর মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে বা মাটি দ্বারা গর্ত ঢেকে দিতে হবে। অতঃপর হালকা সেচ প্রয়োগ বিধেয়। সার প্রয়োগের পর খড়/বিছালী ইত্যাদি দ্বারা জাবড়া (মালচিং) প্রয়োগ করতে হবে যাতে সার ও পানির কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। জিংক সার, ফসফেট সার ও জৈবসার একত্রে মিশ্রিত করে প্রয়োগ করা যাবে না। সাধারণত রাসায়নিক সার প্রয়োগের সপ্তাহ খানেক আগে জৈবসার প্রয়োগ করতে হবে।
- অতঃপর মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (জিংক, বোরন ইত্যাদি) সার ব্যতীত অন্যান্য সার প্রয়োগ করতে হবে। কিছু বুর বুরে মাটির সাথে সুপারিশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সার মিশিয়ে তা গর্তে বা ইতঃপূর্বে কোদাল দ্বারা কোপানো মাটিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। সার দ্রব্য কাচি পাতা, কাণ্ড কিংবা ভিজা পল্লবে যাতে কোনো প্রকারে না পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- পাহাড়ি এলাকায় ডিবলিং পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। যেহেতু ফলগাছে প্রতি বছর সার প্রয়োগ করা হয় তাই ফসফরাস, জিংক, সালফার ইত্যাদি পুষ্টি উপাদানের অবশেষ থেকে যেতে পারে। এমতাবস্থায় মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সারের মাত্রা নির্ধারণপূর্বক সার প্রয়োগ করতে হবে।

মাল্টার স্কেল ইনসেক্ট বা খোসা পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

লক্ষণঃ

ছোট আকৃতির এ পোকা লেবু গাছের পাতা, পাতার বোঁটা, কচি ডগা এবং ফল হতে রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে। এরা দু'ভাবে ক্ষতি করে থাকে। প্রথমতঃ রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছের জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ রস চুষে খাওয়ার সময় এরা গাছের রসের মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ অন্তঃক্ষেপ করে। ফলে আক্রান্ত পাতা, ডগা ও ফলের উপর হলদে দাগ দেখা যায়। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত গাছের সমস্ত পাতা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে।



ব্যবস্থাপনাঃ

১. সম্ভব হলে পোকাসহ আক্রান্ত অংশ অপসারণ করা।
২. হাত দিয়ে পিশে বা ব্রাশ দিয়ে ঘষে পোকা নিচে ফেলে মেরে ফেলা।
৩. আক্রমণের মাত্রা মারাত্মক হলে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে আক্রান্ত গাছে ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা ফেনট্রোথিয়ন ৫০ ইসি অথবা ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি এর যে কোন একটি ১ মিলিলিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

মরিচ গাছের পাতা কুকড়ানো রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

রোগের নাম: পাতা কুকড়ানো

রোগের বিস্তার

বাহক পোকা (সাদা মাছি- *Bemisia tabaci*), ত্রিপস ও পোষক উদ্ভিদের মাধ্যমে ছড়ায়।

রোগের লক্ষণ

- আক্রান্ত গাছের পাতা কুকড়ে যায় এবং স্বাভাবিক পাতার তুলনায় পুরু হয়।
- পাতাগুলো ছোট গুচ্ছাকৃতির হয়। গাছের বৃদ্ধি কমে যায়।
- গাছের পর্বগুলো কাছাকাছি হয় ও গাছ খর্বাকৃতি হয়ে পড়ে।
- গাছে অতিরিক্ত ডালপালা জন্মায় ও ঝোপের মতো হয়। S
- ফল ধারণক্ষমতা কমে যায় এবং ফল আকারে ছোট ও কুকড়ানো হয়।



দমন ব্যবস্থাপনা

- সুস্থ গাছ থেকে পরবর্তী মৌসুমের জন্য বীজ সংগ্রহ করতে হবে। রোগাক্রান্ত চারা কোনো অবস্থাতেই লাগানো যাবে না।
- চারা অবস্থায় বীজ তলা মশারির নেট দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে।
- রোগাক্রান্ত গাছ ও আশপাশের পোষক উদ্ভিদ তুলে ধ্বংস করতে হবে।
- চারা রোপনের ১০-৩০ দিনের মধ্যে তিন বার ১০ দিন অন্তর অন্তর এই পোকা দমনের জন্য প্রতি ১০ লিটার পারিতে ৫মিলি এ্যাডমায়ার/টিডো/গেইন ওষধ প্রতি ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হয়।